Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 29-34
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রেলপথ ও মুসলিম মেয়েরা

ড. খোন্দেকার দিলসাধ হক
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মানবী বিদ্যাচর্চার গবেষণা কেন্দ্র

Abstract

Indian Railway began its journey in the early 19th century and despite a large commercial role it plays in terms of employment for unorganized sector too. Rail hawking was a convenient option for a large section of unskilled and less educated people during midway of twentieth century and muslim women of household pickup trivial job like hawking in local train to keep the subsistence alive. Most of them were poor migrant from villages joined as economic refugees. Though they have faced tremendous socio-political hindrance in sharing space with male hawker in same compartment .Eventually they became essential part in linking between producers and consumers mainly for home-based small scale industries.

The profession of hawking is involved an endless daily fight for survival but they are being unrepresented and marginalized socially ,economically and legally in every way .The question of legitimacy has made this profession more vulnerable with the passage of time. This paper explores the dynamics of work pattern of muslim-nonmuslim female hawkers in local train and role of state to make them a part of sustainable growth and development as they are considerable part of informal economy.

Key Words: Female, Sustainable growth, Informal economy, Hawking, Economic refugees.

শিরোনামেই অনেক অনুমান, অনেক কল্পনা। রেল মানেই যাত্রা জগতে একটা বিপ্লব, একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন। সমাজজীবনেই শুধু নয়, জীবনের অর্থনৈতিক চালচিত্রটাও বদলে যাওয়ার টালমাটাল কাহিনী। সমান্তরাল দুটো লাইন যার শেষটুকু দেখা যায়না কিন্তু কত গ্রাম, কত শহর, কত অজানা পথের উপর দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে, দিতে এগিয়ে চলে সে। সেই পথ ধরে আমরাও পৌঁছে যাই একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। দেশ, কাল, জীবন, সাহিত্যের সরল জটিল যেকোনো অনুষঙ্গেই কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো প্রসঙ্গে এসেছে এই ‘পথের’ কথা। কখনও সে ইতিবাচক ভূমিকায় কখনও বা নেতিবাচক ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থেকেছে।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে রেলপথের কোন অস্তিত্ব ছিল না। দেশ শাসন, বিদ্রোহ, দমন এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য কাঁচামাল বন্দরে পৌঁছুনোর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিল একটা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। কাঁচামালের এমন সস্তা ও লোভনীয় বাজারটিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন-এর প্রসঙ্গটি। উদ্যোগ নেওয়া হল রেলপথ বিস্তারের। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থির হল বেসরকারি বিনিয়োগ ও উদ্যাগে রেলব্যবস্থার পত্তন হলেও তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকবে রাষ্ট্রীয়

শক্তির হাতে। তবে এই বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ ঝুঁকির ভার বহন করতে হল সরকারকেই। উদ্যোগটা বেসরকারি হলেও ঝুঁকিটা রয়ে গেল সরকারের। ঠিক হল রেল কোম্পানিকে তাঁদের বিনিয়োজিত পুঁজির ৪.৫% - ৫% হারে বার্ষিক সুদ প্রদান সহ বিনিময় ক্ষতি (exchange losses) পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ব্রিটিশ সরকার। এইভাবেই একদিন বেসরকারি বিনিয়োগ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির যৌথ সমঝোতায় গড়ে উঠল ভারতীয় রেলপথ। ড্যানিয়েল থর্নার-এর ভাষায় "private enterprise at public risk" যোগাযোগ ব্যবস্থায় অন্য এক দিগন্ত সূচিত হল ঠিকই কিন্তু এই উন্নয়ন মানুষের আর্থসামাজিক জীবনের ঝুঁকিও খানিকটা বাড়াল। বিশেষত বিপন্ন হল গ্রামীণ অর্থনীতি।

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত ভারতের গ্রামগুলি ছিল অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আত্মনির্ভরশীল এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একদিকে যেমন উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের দ্বারা পুরোপুরিভাবে খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা মিটিয়েও স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য উদবৃত্ত থাকত তেমনই আবার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দ্বারা তৈরি উৎপাদিত পণ্য দ্বারা গ্রামের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসের চাহিদাও মিটত। রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজপণ্যের বিপুল বাণিজ্যায়ন শুরু হল। আত্মপোষণশীল অর্থনীতির হাতিয়ার রূপে যে কৃষিজ শষ্য একসময় গ্রামের মানুষের সমস্ত চাহিদা মিটিয়ে আসছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার এই সম্প্রসারণ-এর ফলে অত্যন্ত সস্তা দরে এই সব পণ্য গ্রাম থেকে শহরে আসা শুরু করল। শুধু তাই নয় রেলপথ বিস্তারের জন্য সরকারি আদেশে নষ্ট করা হল বহু চাষের জমি। পশ্চিম থেকে পূর্ব যেখানে, সেখানে রেলের জন্য রাস্তা তৈরি হয়েছে সেখানেই জমিহারা হয়েছেন বহু মানুষ। সরকারি তরফে মিলেছে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ। স্বনির্ভরশীল এই গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়ার পিছনে রেল ব্যবস্থায় যে ভীষণ ভাবে দায়ী সে বিষয়ে তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহল একমত ছিলেন।বাষ্পীয় শকটের সদর্প পদভারে একদিকে দুনিয়া যখন কাঁপছে অন্যদিকে দেশের এ'প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে রেলব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। অর্থনীতিবিদ্ রমেশ চন্দ্র দত্ত সরাসরি বললেন, রেল ব্যবস্থা হল সখের অপচয়' (a wasteful expenditure) তাঁর মতে, যথাযোগ্য রাস্তাঘাট ও বড়, বড় খালের মত জলপথ তৈরির মাধ্যমেই দেশের উন্নতি করা সম্ভব। প্রকৃতিকে খণ্ড বিখণ্ড করে শৌখিন কারিগরী আবর্জনা স্বরূপ দেশের সর্বত্র ইস্পাত লাইনের শাখাপ্রশাখা বিস্তার সভ্যতার অগ্রগতিতে আজ একটা মাইল স্টোন। ধনবিস্তারকারী লোভী ইংরেজ ভারত লুণ্ঠনের কারিগরী হাতিয়ার রূপে রেলকে যেভাবে ব্যবহার করে গেছে তাতে দেশের মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষয়ক্ষতিটুকু এড়াতে পারেনি। তবু রেল দিয়েছেও অনেক কিছু।

রেলপরিবহণ ব্যবস্থা যখন বেশ একটা নিয়মিত পরিষেবা হয়ে উঠল তখন এই রেলগাড়ি অর্থাৎ লোকাল ট্রেনেই জমে উঠল হাজার জিনিসের বিকিকিনি।রেল ব্যবস্থার বয়স যত বেড়েছে, রেলপথকে অবলম্বন করে পুরুষেরা ততই নানারকম কাজের সন্ধান পেয়েছেন। মুসলিম-অমুসলিম মেয়েরা সেই বৃত্তে ঢুকছে বেশ কিছুটা দেরিতে, হয়তো রুজির অন্য আবর্তগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই।সুযোগের অগ্রাধিকারকে কাজে লাগিয়ে রেলপথের সঙ্গে পুরুষরাই গাঁটছড়া বেঁধেছে মেয়েদের অনেক আগে। জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে। বলছি সেই 'ক্যানভাসারদের' কথা ক্যানভাসিং করে যারা রেলগাড়িতে পণ্য বিক্রির একটা উপজীবিকা গড়ে তুলেছিল। রেলের ফেরিওয়ালা নয়, তখন তাদের বলা হত 'রেল ক্যানভাসার'। ক্যানভাসারই আসলে রেলবগির 'আদি ফেরিওয়ালা।' মেয়েরা তখনও রেলপথে ফেরির কাজে আসেনি।

উপজীবিকা হিসাবে রেলপথকে বেছে নেওয়ার তাগিদ মুসলিম মেয়েরা অনুভব করেছে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। রেলপথে মুসলিম-অমুসলিম মেয়েদের প্রথম দেখা মেলে 'কয়লা কুড়ানি' হিসাবে। তখন যুদ্ধের সময় অত্যাবশকীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। জ্বালানির কয়লা সাধারণের কাছে বেশ দুষ্প্রাপ্য। রেলগাড়ি, বিশেষ করে মালগাড়ির পোড়া কয়লা কুড়িয়ে গরিব নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা তখন স্থানীয় বাজারে কিংবা গৃহস্থের ঘরে-ঘরে চালান দিয়ে দু'চার পয়সা রোজগারের উপায় পেয়েছিল। রেলইঞ্জিন থেকে এ'ভাবে বিনা পয়সায় ঝাড়া কয়লা পাবার বিনিময়ে তারা কখনও ডিম, কখনও পাকা কলা, কিংবা সিগারেট ভেট্ রেখে দিত ড্রাইভার বা খালাসিদের

জন্য। রেলপথে কয়লা কুড়ানি হিসাবে মেয়েদের এই উপজীবিকাটি সম্পর্কে এছাড়া আর বিশেষ কিছুই জানা যায়না। লাইনের ধারে কয়লা কুড়ানি থেকে বেসাতি নিয়ে সটান রেল বগিতে উঠে পড়ার যুদ্ধটা মুসলিম মেয়েদের কাছে আদৌ সহজ ছিলনা (আজও নেই বোধহয়)। দেশ ভাগের ফলে উদবাস্তু সমস্যা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, মানুষের জীবিকা আর বাসস্থানের উপর বাড়তি চাপ পড়ে। দেশ বিভাগের সমকালে দুই ভাঙ্গা দেশের অর্থব্যবস্থাই টাল খেয়ে গেল। দেশচ্যুত, আবাসচ্যুত, এতকালের দৈনন্দিন থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব মানুষ স্বনির্ভর জীবিকা খুঁজতে বাধ্য হয়। শহর জুড়ে ছোট ব্যবসায়ী আর ফুটপাথ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। পুনর্বাসনের সমস্যা সেই সঙ্গে সমস্যা কর্মসংস্থানেরও। মৌমাছির চাষ, গো পালন, দেশলাই উৎপাদন-এর কাজে যুক্ত হবার সঙ্গে, সঙ্গে অনেকেই তখন 'রেলহকারি' শুরু করে। যদিও রেলগাড়িতে ফেরি কাজের প্রাথমিক সূচনাটি ক্যানভাসারদের হাত ধরে অনেক আগেই হয়ে গেছে। এখন সেটা বানের জলের মতো হু, হু করে বাড়তে লাগল।

জীবিকা হিসাবে রেল স্টেশনকে বেছে নেওয়ার কিছু সঙ্গত কারণ অবশ্য ছিল। পূর্ববাংলা থেকে বনগাঁ বা বার্ণপুর দিয়ে বেশির ভাগ মানুষই শিয়ালদহ স্টেশনে আসত। সেখান থেকে তাঁদের পাঠানো হতো বিভিন্ন ট্রানজিট্ ক্যাম্পে। প্রায় সত্তর, পচাঁত্তর হাজার শরণার্থীর তুলনায় আশ্রয় শিবিরের সংখ্যাটা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। কাজেই রেলস্টেশনের প্রশস্ত প্লাটফর্মেই প্রতিদিন প্রায় পাঁচহাজার মানুষ বাস্তুহীন অবস্থায় পড়ে থাকত। এদের মধ্যে অনেকেই একদিন রেলের খালি জমিতেই তাদের আস্তানা গড়ে তুলল আর রেলপথকেই বেছে নিল তাদের জীবিকা হিসাবে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১ শরণার্থীদের আগমন এবং সংশ্লিষ্ট জীবন-জীবিকার জটিল প্রশ্নটি বারে বারেই পুরুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। পথে ঘাটে ফিরি, কলে-কারখানায় পুরুষের পাশাপাশি কাজ করবার সুযোগ যে নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা অনেক আগেই পেয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর আদম সুমারী এবং পর্যটন বিবরণীতে তাঁর হদিস মেলে। তবে শ্রমের অর্থমূল্য আর আনুষঙ্গিক অধিকারের প্রশ্নে নারীশ্রমিকের জায়গা পুরুষের নীচে।

উনিশশতকে মুসলিম নারীর শ্রমের ব্যাপারটাকে খুব সুনজরে দেখা হতো না। মহেশ গল্পের শেষ কটি লাইন এ'প্রসঙ্গে মনে পড়ে। গফুর আমিনাকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করার কথা ভাবছে কিন্তু সেখানে মেয়েদের ইজ্জত,আব্রু থাকেনা। আদ্যপান্ত গ্রামীণ কৃষিজীবী গফুর যখন চটকলে কাজের কথা ভাবে, বোঝা যায় সামন্ততন্ত্রে ভাঙন লেগেছে, কৃষির পাশাপাশি শিল্প কারখানার উত্থান ঘটছে, সেই সঙ্গে জন্ম হচ্ছে 'শ্রমিকশ্রেণীর।' ফেরিওয়ালাকে শ্রমিক ভাবা হয়নি কোনোদিনই। শ্রমিক মানেই তার শ্রম নিয়ন্ত্রণকারী মালিক গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু ফেরিওয়ালা নিজেই নিজের শ্রমের মালিক। তবে শ্রম তা সে উৎপাদনশীল হোক কিংবা অনুৎপাদনশীল, নারীর কাজ তা ঘরে হোক কিংবা বাইরে, মর্যাদায় সর্বদাই সে পুরুষের পিছনে। শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈষম্যমূলক মজুরিনীতি এবং উৎপাদনের যাবতীয় একপেশে শর্ত মেনে পুরুষের সাহায্যকারীর পরিচয়ে শ্রমজীবী নারীর উত্থান। একই আখ্যানের বিকল্প বিন্যাস পাই, যখন রেলপথে, অনুৎপাদনশীল ফেরির কাজেও পুরুষ প্রাধান্যকে মেনে নিয়ে একসময় প্রবেশ করে মুসলিম-অমুসলিম মেয়েরা।

রেলবগিতে ফেরি করে যারা, তাঁরা শ্রমিক নয়, তাই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের কি প্রতিবাদের ইতিহাসে তারা অনুপস্থিত। প্রলেতারীয় বলে যে খেটে খাওয়া মেয়েদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতির লড়াই-এর কথা আমরা এতদিন জেনে এসেছি সেখানে কোথাও তো পাইনি রেল হকারনির কথা। কর্মজীবী মেয়েদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে মূলত: কারখানার খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহিলা সমাজ। প্রলেতারীয় আর বুর্জোয়া নামে ওঁরা তৈরি করেছেন চাওয়া-পাওয়ার আলাদা আলাদা ভাষা। কিন্তু ফেরির কাজকে কোনদিন উৎপাদনশীল শ্রমের অঙ্ক হিসাবে গণ্য না করায়, ফেরিওয়ালিদের নিয়ে তৈরি হয়নি আলাদা কোন সংগ্রামের ইতিহাস।

একসময় রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগে বাংলার ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মঞ্চে ওঠাটা যেমন খারাপ চোখে দেখা হতো, তেমনই কোনো মুসলিম মেয়ে রেলের বগিতে হেঁকে হেঁকে ঘুরছে তার বেসাতি নিয়ে, এ'দৃশ্য কল্পনা করাও ছিল কষ্টকর। বিশ শতকের ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে অবশ্য রাতারাতি দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করে। লেভি ব্যবস্থার কঠোরতা, আর কালোবাজারীর দাপটে শিয়ালদহ, বনঁগা লাইনে দলে দলে দু:স্থ মুসলিম-অমুসলিম মেয়েরা চাল পাচারের কাজে নেমে পড়েন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ওপার বাংলা থেকে আসা বাস্তুহীন মানুষ। '৬২ সাল নাগাদ রাজশাহী, পাবনা ও ঢাকার সাম্প্রদায়িক হামলার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষের সংখ্যা আরো বেড়েছে। '৭১-এর রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে আরো বেশি অনিশ্চিত করে তোলে। মেয়েদের খুব স্বতন্ত্রভাবে এই পেশাটি বেছে নেওয়ার অন্য একটা সুবিধা ছিল। কোচরে অনায়েসেই ৪/৫ কেজি চাল বেঁধে নেওয়া যেত। মানসম্ভ্রম নারীত্ব আপাতত মূলতুবি। মহিলা বলে পুলিশ ঘাটাঘাটিতা একটু কমই করত। কারণ ইজ্জত আব্রুর প্রশ্নে ঝামেলা বাঁধাবার ভয় তো ছিলই। মনে হয়, আজকের, একুশ শতকের তুলনায় বেশিই ছিল। মেয়ে হওয়ার এই সুবিধাটুকু যত অসম্মানেরই হোক তা নিয়েই একসময় চোস্ত চাল পাচারকারিণী হয়ে উঠলেন তাঁরা। সময়ের তালে তাল মিলিয়ে যে কোনো পেশায় উন্নত কৃতকৌশলের সন্ধান শুরু হয়। এখানেও অন্যথা হলো না। চালবহনের জন্য বিশেষ একধরণের জামা তৈরি শুরু করল একদল দর্জি। বিশেষ আকৃতির ঐ ছোট্ট জামায় ৮-১০ কিলো চাল এঁটে যেতো। জামা ছাড়াও ছোট, ছোট ঘি, সর্ষের তেলের টিনে চাল ভরেও চালানের কাজ চলত। শিয়ালদহ-বঁনগার লোকাল ট্রেনে এইসব মহিলারা দিনে চার পাঁচবার যাতায়াত করে ৪০-৭০টা: রোজগার করতেন। তাদের পেছনে থাকত আড়কাঠিরা আর তার পেছনে মাড়োয়ারি মহাজন।

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত যে কোন নারীর স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার প্রশ্নটি দুটো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত (১) তার শিক্ষা (২) আর্থিক দুরবস্থা।

প্রথমটির জন্য খোঁজা হয় সম্মানজনক এবং মর্যাদাকর কোনো পেশা যেখানে মেধা, বৈদগ্ধ্যের চর্চার সুযোগ পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয়টির জন্য খোঁজা হয় কায়িক শ্রম বেচার পথ। সোজা কথায় যাকে বলে গতর খাটিয়ে খাওয়া। সুস্থজীবন বিকাশের একটা প্রশস্ত রাজপথ তো সবাই চায়। তা সে কায়িক শ্রম বিনিময়ে হোক কিংবা মানসিক শ্রম। এক্ষেত্রে অবশ্য কাজের বৈধ-অবৈধ স্বরূপটা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে পারে। কষ্টার্জিত আর্থিক স্বাধীনতার ভালো মন্দ সাদাকালো দিকটা প্রায়শই যে প্রশ্নের কিনারায় এসে আটকে যায় তা হলো শ্রম বেচে যে মানুষটা খায় তার সেই শ্রম বিক্রি কতখানি বৈধনীতির তোয়াক্কা করে চলছে? স্বনিযুক্তির সহজতম পথ রূপে আর পাঁচটা সাধারণ কাজের মতই পথেঘাটে হাটে বাজারে নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়েরায় যে ফেরির কাজ করত উনবিংশ শতকের ফেরিকাজের অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে তথ্য উঠে এসেছে।

কয়লাকুড়ানি, চালপাচারকারিনী কিংবা রেলের হকারনি হয়ে ওঠার পেছনে আর্থসামাজিক কারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে ছিল আরো একটি বড় কারণ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশপাশি দেশটাকে ভেঙে ফেলে যেন বহুদিনের বিদেশি শাসন থেকে মুক্তির আর সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের নির্বিকল্প উপায় দর্শানো হলো। সেই ভাঙন থেকে নিত্য নতুন ভাঙনের অভিজ্ঞতায় আমরা আজও দীর্ণ। স্বাধীন ভারতের একটা বড় সমস্যা ছিল 'জীবিকা।' একটা বিভাজন রেখা শুধু দেশের আয়তনকেই সংকুচিত করেনি, উপরি পাওনা হিসাবে তখন মিলেছিল বাড়তি জনসংখ্যা আর অর্থনৈতিক চাপ। এই বাড়তি জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার বিকল্প কর্মসংস্থান এবং ত্রানের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। তাই সহায় সম্বলহীন দিশাহারা মানুষজনের অনেকেই সে পথ-ঘাটকে আঁকড়ে ধরেছিল সে কথা আগেই বলেছি কিন্তু লোকালে ট্রেনের 'নেসেসারি ইভল' হয়ে উঠতে মুসলিম মেয়েদের যথেষ্ট সময় লেগেছে। ট্রাজেডিটা এখানেই।রেল পসারিনী হয়ে ওঠার লড়াইটা মুসলিম মেয়েদের কাছে যতখানি চ্যালেঞ্জের, ততখানি বিস্ময়ের। চালপাচারের ইতিহাসের সঙ্গে একসময় যেসব মুসলিম-অমুসলিম মেয়েরা জড়িয়ে পড়েছিলেন, রেলবগির পরিবেশটাকে সম্পূর্ণ অন্য কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁরা। সতীত্ব,

সম্ভ্রম, লজ্জা, ছেড়ে তাঁরা তখন নিজেদের বেশ শক্ত ধাঁচে গড়ে নিয়েছিলেন। যাত্রী, পুলিশ সকলের নাকের ডগায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই সকল পাচারকারিনীরা এক সময় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন নিজেদের কাজে।

পাচারকারিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে রেলফেরির একটা যোগ আছে। কারণ পরবর্তীকালে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে এলে পাচারকারিনীরা অনেকেই চোরাচালানের পথ ছেড়ে রেলগাড়িতে ফেরি করা শুরু করেন। সৎ পথে খেটে খাওয়ার ইচ্ছা তাঁদের সকলেরই ছিল কিন্তু অন্যোন্যপায় হয়ে প্রথম জীবনে তাঁরা এই ধরণের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যান।

লোকাল ট্রেনের কামরায় যে কোনো কাজেরই একটা ইতিহাস-ভূগোল আছে। ইতিহাস হলো প্রধানত: দেশেরই সমাজ ইতিহাস আর ভূগোল হলো অঞ্চলের দ্যোতনা। কাজেই পথঘাট ছেড়ে রেলগাড়ির কামরায় বেসাতি নিয়ে হাজির হওয়ার পিছনে ইতিহাস-ভূগোলের একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থেকেই যায়। সেখানে বারে, বারে ফিরে এসেছে দেশভাগজনিত গ্লানি আর যন্ত্রনার কথা, উদবাস্তু সমস্যা, পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কাহিনী। উনিশশো সত্তরের বছরগুলির মাঝামাঝি মুসলিম মেয়েরাও যে বাড়ির বাইরে কাজের জন্য বেরিয়ে আসছে তার পেছনে ছিল উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশের চাপ।পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চোখ রাঙানিকে সেদিন উপেক্ষা করেই গল্পের পুষ্পবালারা হয়ে উঠল বাস্তবের সফুরা, মুন্নী বিবি, রানুবালা, মিনতি দে, কিংবা ঝরনা মুখার্জির মতো 'রেল পসারিনী।' দশজন রেলহকারের সঙ্গে একজন হকারনির অভ্যুত্থান। পুষ্প থেকে 'পুতুলের মা' হয়ে উঠবার পথে যে কঠিন লড়াই আর প্রবল প্রতিবন্ধকতা সমরেশ বসুর 'পসারিনী' গল্পে পুষ্পর অভিজ্ঞতা, সেই একই ভার বাস্তবে বহন করেছে ঝরনা, সফুরা, আল্পনা, মুন্নী বিবি কিংবা রানুবালা সাহা তাদের রেলহকারনি জীবনের প্রথম প্রথম।

তাঁদের দেখানো পথে গত তিরিশ বছরে আরো মহিলারা রেলবগিতে ফেরির কাজে এসেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ বারো বছর ধরে কাজ করছেন কেউ বিশ বছর ধরে। কেউ আবার মাত্র দু'মাস। রেলের মহিলাবগিকে ঘিরেই তাঁদের বাঁচা মরার লড়াই। মাইমুন, জ্যোৎস্না, মুন্নীবিবি কিংবা মনা মণ্ডলরা অন্য বগিতে তাঁদের বেসাতি নিয়ে ওঠেননা। বৃহত্তর সমাজের রক্ষণশীল ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসেও ক্ষুদ্র পরিসরে আজও তাঁরা একটা রক্ষণশীল পরিবেশই খোঁজেন।আত্মমর্যাদা আর ইজ্জত-আব্রুর বালাই একশভাগ মেনেই কিন্তু সেই মেয়েটি সাধারণ বগিতে পা রাখেন না। সমাজের অগ্রগমন-পশ্চাদপসারণের আখ্যানকে এখানে আবার নতুন করে সাজাতে ইচ্ছা জাগে। দৃষ্টিভঙ্গির সাবেকি নকশাটা যে আজও প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক কোনো স্তরেই তেমন বদলায়নি, বদ্ধ রেলকামরার আবর্তটুকুও আপাত-বদলের অন্তর্লীন সেই না-বদলেরই ধুয়ো গেয়ে যায়।

সকালে ঘর সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ এঁরা সকলে বেরিয়ে পড়েন। স্থানীয় কারবারি কিংবা মহাজনের কাছে ধারে ৩০০-৪০০ টাকার মাল তোলেন। তারপর রেলের মহিলা বগিটিকে টার্গেট করে ছোটেন। অধিকাংশের আয় রেখাটা এমনই যে দৈনন্দিন বাজেট রেখার সঙ্গে ভারসাম্য বিধানে তীব্র সংকট উপস্থিত হয়। তবু নিরাপত্তাহীন, বৈচিত্র্যহীন এই কাজে তাঁরা মানিয়ে নিয়েছেন পারিবারিক চাপে, অর্থনৈতিক চাপে, আর জীবনধারণের তাগিদে। এঁদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরোননি দারিদ্র্য, অভাব, অনটন আর পারিবারিক সামাজিক পরিমণ্ডলের কারণে। এই রেলগাড়িতেই কেউ তিরিশ বছর ধরে কাজ করছেন, কেউ বা আবার কাজে নেমেছেন মাত্র আট মাস। আগে এঁদের অনেকেই বাড়িতে, বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। কারও বা বই বাঁধাই, আয়ার কাজ, কিংবা প্লাসটিকের কারখানার কাজের অতীত অভিজ্ঞতা। স্থানীয় হাটে বাজারে ব্যবসাপাতি করার অভিজ্ঞতা নিয়েও কেউ কেউ এসেছেন। তবে রেলবগিতে সে সব অভিজ্ঞতা কাজে দেয় না। ফেরি কাজের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক চরিত্রটা রেলের মহিলা বগিতে একলহমায় বদলে যায়।সমষ্টিগত চেতনা আর বিশ্বাসের জমি তৈরি আছে রেল হকারনিদের নিজেদের মধ্যেও। ওঁদের নিজেদের মধ্যেই কাজের ভাগ, সময়ের ভাগ এমনকি স্টেশনেরও ভাগ থাকে। একই ইমিটিশনের জিনিস নিয়ে হয়তো তিনজন উঠলেন একই গাড়িতে। নির্দিষ্ট স্টেশন পর্যন্ত প্রত্যেকেরই কাজের ভাগ আছে। সকলে তখন একত্রে হাঁকাহাঁকি করেননা।নতুন কেউ কাজে নামলে, সকলে

মেনে নেন, মানিয়েও নেন। দু'একজন কমবয়সি উঠতি হয়তো বিরোধিতা করেন প্রথম, প্রথম, কিন্তু বাকিদের সায় না পেয়ে খামোশ খেয়ে যান।

হাওড়া-উলুবেড়িয়া লাইনে মীনাবেগম কমলালেবু বেচেন।আমার সমীক্ষায় সংগৃহীত নমুনা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি হাওড়া-শিয়ালদহ শাখা মিলিয়ে ২৭% মহিলা ফল বিক্রি করেন। এদের অধিকাংশেরই বয়স ২৮-৩৫-এর কোঠায়।এঁদের অনেকেই মুসলিম।মাইমুন খাতুন, মাস আষ্টেক হলো হাওড়া-পাঁশকুড়া লাইনে ফল বিক্রির কাজে নেমেছেন। শুরুতেই দু'একজন প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। মাইমুন সোজাসুজি বলেছিলেন 'তোরা আমাকে দিন কুড়ি টাকা দে, আমি কাজ করবনা।' ওঁরা বুঝেছিলেন। মাইমুনের কথায় আর্শিতে নিজেদের ছবিটাই দেখতে পেয়েছিলেন। তাই আর কোনো জবাব দিতে পারেননি ওঁরা।বিশেষ কোন কারিগরি প্রশিক্ষণ কিংবা হাতের কাজকর্ম না জানার ফলে তাঁদের মধ্যে শ্রম সচলতার অভাব। বিশেষীকৃত শ্রমদানের জন্য দরকার হয় উপযুক্ত দক্ষতা আর শিক্ষা। তাই ফেরির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প কর্ম সংস্থানের বন্দোবস্ত করা সহজ নয়। তাই যতদিন রেলবগির ইস্পাত কঠিন জমিটা আছে ফলের ঝুড়ি, ইমিটিশনের ডালা, আতবচালের ঝুড়িভাজাও থাকবে।একটা শতক পেরিয়ে আমরা আর একটা নতুন শতকে পৌঁছে গেলেও ওঁদের এই বিরামহীন সংগ্রামের কাহিনী ফুরোয়না। চালওয়ালি, আনাজওয়লি, ফলওয়ালি – 'মাসিপিসি ফেরিওয়ালির' স্বাধীন এই জীবন-জীবিকা নিয়ে তবু কি সমাজ দু'চার কথা না বলে থাকে?

"শতবর্ষ এগিয়ে আসে - শতবর্ষ যায়
চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়।"

তথ্যসূত্র:

১) রাধারমণ মিত্র, ***কলিকাতা দর্পণ,*** সুবর্ণরেখা, এপ্রিল ১৯৪২।
২) সিদ্ধার্থ ঘোষ, ***কলের শহর কলকাতা,*** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ২০০০।
৩) ড: সুকুমার সেন, ***রেলের পা-চালি,*** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ২০০০।
৪) তারাপদ সাঁতরা, ***স্মৃতির আলোয় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে : সেই সময় ও পরবর্তী রূপান্তরের আলেখ্য,*** আশাবরী পাবলিকেশন, অক্টোবর ২০০২।
৫) প্রদোষ চৌধুরী, ***রেল কৌতুকী,*** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৭।
৬) চিত্তরঞ্জন দাস, 'হাট', ***সাহিত্য পরিচয়,*** ক্যালকাটা বুক হাউস, ফেব্রুয়ারী ২০০১।
৭) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ***উদ্বাস্তু,*** শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা: লি:, আগস্ট ১৯৭০।
৮) সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, **'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নারীর অধিকার', *ইতিহাস অনুসন্ধান ১৯,*** পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে এল এস প্রা : লি :, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারী, ২০০৫।
৯) শরৎ চন্দ্র চট্টপাধ্যায়, ***মহেশ,*** **পুনশ্চ** কলকাতা, ১৯৯২।
১০) রূপা আইচ (স.,) ***মার্কসীয় বীক্ষায় নারীমুক্তি,*** ইম্যান্সিনেশন পাবলিকেশন, ২০০৬।
১১) জয় গোস্বামী, ***কবিতা সংগ্রহ,*** আনন্দ, ১৯৯৭।
১২) সমরেশ বসু, 'পসারিনী', ***বাছাই গল্প,*** মণ্ডল বুক হাউস, অকেক্টাবর ১৯৮১।
১৩) প্রফুল্ল রায়, ***কেয়াপাতার নৌকা,*** (দ্বিতীয় পর্ব), করুণাপ্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।
১৪) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ***পূর্ব পশ্চিম,*** **দ্বিতীয় খণ্ড,** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮৯।
১৫) সুধীর চক্রবর্তী, **'সরজুর সাক্ষাতকার',** ***নির্বাস,*** থীমা, ১৯৯৫।
১৬) **সাক্ষাতকার গ্রহণ** – মাইমুন খাতুন, জ্যোৎস্না, মুন্নীবিবি, সফুরা মন্ডল, ঝরনা মুখার্জি, মীনা বেগম, আল্পনা দন্ডপাত ও অন্যান্য, অগাস্ট ২০০৭, (হাওড়া-দক্ষিণপূর্ব শাখা ও শিয়ালদহ উত্তর-দক্ষিণ শাখা)।